সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন

শাহরিয়ার কবির

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। যখন সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়নি, যখন বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিপ্রয়াণ ঘটেনি–তখন দুর্গাপূজা নিছক ধর্মীয় উৎসব ছিল না, দুর্গাপূজার প্রাঙ্গণ ছিল ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত নির্বিশেষে বাঙালির মিলনমেলা। মুসলমানদের ঈদ এবং খ্রীস্টানদের বড়দিনের উৎসবও এক সময় ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে ছিল। ধর্মের নামে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও হানাহানি তখনও বাঙালিত্বের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি।

'৪৭-এর দেশভাগের পর বাংলাদেশ যখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়–এ দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দুর অভিপ্রয়াণ ছিল বাঙালিত্বের চেতনার উপর সবচেয়ে বড় আঘাত। ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকরা বাংলাকেও দু'টুকরো করেছিল। ধর্ম কীভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মনুষ্যত্বকে হত্যা করে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই উপমহাদেশে সোয়া শ' বছরের সাম্প্রদায়িক হানাহানির ভেতর, যার চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষের বিভক্তিকরণ এবং পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে। ইংরেজরা চলে গেলে ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর শাসনে মুসলমানরা নিরাপদ থাকবে না–এই যুক্তিতে যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা ঠিকই জানতেন পাকিস্তানের অভ্যুদয় কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী নেতারা জিন্নাহকে এমনও বুঝিয়েছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ভারতের সব মুসলমান কখনও পাকিস্তান যাবে না, বরং ভারতের মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পাবে, তারা আরও হীনবল হবে। জিন্নাহ কোন যুক্তির ধার ধারেননি। তিনি চেয়েছিলেন ক্ষমতার শীর্ষ আসনটি। ভারতবর্ষে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলের মতো নেতা থাকতে তাঁর পক্ষে দিল্লীর মসনদে বসা সম্ভব হবে না মূলত এই বিবেচনা থেকেই জিন্নাহ পাকিস্তান চেয়েছেন এবং এর জন্য হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা জাতি, একসঙ্গে তারা থাকতে পারে না এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর এই জিন্নাহই আবার ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার কথা বলেছেন। আরও বলেছেন পাকিস্তানে মুসলমান, হিন্দু, খ্রীস্টান বৌদ্ধ, শিখ সবাই সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে। জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে, বিলেতফেরত আধুনিক ব্যারিস্টার ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকেও সেক্যুলার ছিলেন (যাঁকে এক সময় সরোজিনী নাইডু 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই জিন্নাহ পরে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন এবং এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন, যার জন্য বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হয়েছে কয়েক কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা।

মাতৃভূমি বা জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার বেদনা মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। তবে ধর্মীয় পরিচয়কে যদি বিবেচনায় আনা হয় দেখা যাবে, এই বেদনা মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর অনেক বেশি। ধর্মের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত মুসলমানরা মনে করে, তাদের কোন মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি নেই। যেখানে ধর্মপালন-প্রচার ও জীবিকার সুযোগ রয়েছে, মুসলমান সেখানেই গেছে এবং এ কারণেই ইসলাম ধর্ম এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম অনুষঙ্গ স্বদেশপ্রেম–স্বদেশকে মাতৃরূপ বন্দনা। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এর সঙ্গে আরও যুক্ত রয়েছে ধর্মীয় আচার। ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় কতটুকু আছে জানি না–বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচারের ভেতর পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো একটি অবশ্যকর্তব্য। নিতান্ত বাধ্য না হলে বাঙালি হিন্দু সাধারণভাবে চিরদিনের জন্য ভিটেমাটির বাঁধন ছিঁড়তে পারে না।

পাকিস্তান হওয়ার পর দেখেছি, ভারতের মুসলমান যারা পাকিস্তানে এসেছে সাধারণভাবে তাদের লক্ষ্য ছিল অধিক প্রাপ্তি, আর পাকিস্তানের যেসব হিন্দু ভারতে গেছে, তার প্রধান কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, তাদের বাধ্য করা হয়েছে জন্মভূমি ত্যাগ করতে। দেশভাগের সময় বিহার, গুজরাট, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বটে তবে এই নির্যাতিতরা সবাই পাকিস্তানে আসেনি, অনেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় সরে গেছে। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন জিন্নাহর মতো নেতাও বোম্বে ও দিল্লীতে সম্পত্তি কিনেছেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি যেমন মেনে নিতে পারেনি, ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গও সচেতন বাঙালি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশকে দু'টুকরো না করার জন্য সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের আন্তরিক উদ্যোগের কথা আমরা জানি। দুর্ভাগ্য এই যে, মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস উভয় দলের শীর্ষ নেতারা তখন পাঞ্জাবের মতো বাংলাকে দ্বিখণ্ড করার পক্ষে ছিলেন। বাঙালিত্বের উপর প্রথম আঘাত এসেছিল ১৯০৫ সালে, যে আঘাতের চিহ্ন ছ' বছর পরই মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালের আঘাতের চিহ্ন কখনও মুছবে বলে মনে হয় না।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে মূলমন্ত্র হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছে তার প্রধান কারণ যদিও বাঙালির প্রতি পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের কলোনিসুলভ মনোভাব–এর পাশাপাশি লক্ষ্য ছিল বাঙালির চেতনায় যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের

মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে এককভাবে পূজা অনুষ্ঠান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালেই গ্রামাঞ্চলে বর্ণবিভেদ ভুলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে পূজার অনুষ্ঠান শুরু করেন, যা এখন 'সর্বজনীন পূজা' হিসেবে পরিচিত। পুরো প্রত্যয়টিই ছিল নতুন। কারণ, এর আগে এখানে এভাবে পূজা অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা হয়নি।' (বাংলাদেশের উৎসব, মুনতাসীর মামুন, ঢাকা-১৯৯৪, পৃঃ ৮৮)

মামুনের গবেষণা পূর্ববঙ্গের ভেতর সীমাবদ্ধ। আমরা যদি বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করি তাহলে দেখব, ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সর্বজনীন দুর্গাপূজা'য় অংশগ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন। বাঙালিত্বের চেতনায় হিন্দু-মুসলমান দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একযোগে ব্রিটিশ শাসকদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। কবিগুরুর মিছিলে অংশ নিয়েছেন ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালি। একে অপরের হাতে সৌভ্রাত্রের রাখি বেঁধেছেন। এভাবেই ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশের সুধী সমাজ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে তখন উৎসাহিত করা হয়েছিল সর্বজনীন দুর্গাপূজা ও শারদোৎসবকে। 'বিজয়া-সম্মিলন' বাগধারাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম সচেতনভাবে চেয়েছিলেন দুর্গাপূজাকে বাঙালির সামাজিক উৎসবে পরিণত করতে এবং বাঙালিত্বের চেতনায় এই উৎসব সম্পৃক্ত করতে। ১৯০৫ সালের বিজয়া দশমী উপলক্ষে তিনি এক অসাধারণ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যেখানে দুর্গাপূজার ধর্মীয় পরিচয় অতিক্রম করেছিল স্বদেশপ্রেম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন–'আশা করি আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-সম্মিলন যে-একটি নতুন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পড়িল, সেই জীবনধারা কোনো দুর্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয়; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন-উৎস বিধাতার সংকেত মাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনোদিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

'এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম; এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন –এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গিয়াছে, সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

'একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংহত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধবসম্মিলন নহে, আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।...

'বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন করিয়া সরিয়া গিয়াছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এই-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম –বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেইজন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না–আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। (সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল। বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি, আমরা ধন্য হইলাম।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা, বাঙালিত্বের চেতনা ধ্বংস করা। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষ চরম নির্যাতন ভোগ করছেন গত তিন বছর ধরে, অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। সরাসরি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, কিন্তু গত বছর দেখেছি, এ বছরও দেখছি–নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা রেকর্ড সংখ্যক পূজামণ্ডপ নির্মাণ করে। এখনও পূজামণ্ডপে হামলা হয়, সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা এখনও প্রতিমা ভাঙ্গে, লুট করে নিয়ে যায় পূজার উপকরণ; তারপরও তারা দুর্গাপূজা বন্ধ করতে পারেনি। এ প্রতিবাদ শুধু নির্যাতিত হিন্দুর নয়, এ প্রতিবাদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক সমগ্র বাঙালি জাতির। পুরাণে কিংবা ইতিহাসে অসুর ও পাশবশক্তি কখনও জয়ী হতে পারেনি।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদীরা কিংবা ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বহু রক্ত ঝরিয়েছে, তারপরও তারা ধর্মপালন থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারেনি। একজন মুসলিম মৌলবাদী যখন অমুসলমানকে হত্যা ও নির্যাতন করে তখন তা করা হয় ধর্মের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে। একইভাবে হিন্দু মৌলবাদীরা যখন অহিন্দুদের হত্যা ও নির্যাতন করে সেটাও করা হয় হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে। মৌলবাদীদের কাছে ধর্ম হচ্ছে ক্ষমতায় থাকার বা যাওয়ার রাজনৈতিক হাতিয়ার, পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দানবীয় অস্ত্র। একজন শ্রেয়োচেতনার মানুষের কাছে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তর্গত, যার সঙ্গে ক্ষমতা, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলাদলির কোন সম্পর্ক নেই। যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে, হানাহানি-হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতনে মানুষকে প্ররোচিত করে সেটা ধর্মের নামে অধর্ম, যার মূলোৎপাটন ছাড়া মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারবে না। ঈদ, বিজয়া সম্মিলন, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থে আবার সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে পরিণত হবে, বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে মানব জাতির মহামিলনের জয়গান গাইবে। এই প্রত্যয় ও স্বপ্ন নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে।

গ্রেনেড হামলার তদন্ত কোন্ পথে?

মেজর আসলাম হায়দার, পিএসসি (অব)

স্মরণকালের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার স্মৃতি আস্তে আস্তে ধূসর হতে শুরু করেছে। সরকার এবং বিরোধী দলের ঠেলাঠেলিতে প্রকৃত রহস্য বা হামলার স্বরূপ এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছে। দু'দলের নেতাকর্মীরা একে অন্যের ওপর দোষ চাপানো নিয়েই ব্যস্ত। ঘটনার পেছনে থেকে যারা এই হামলার মদদ যুগিয়েছে আর যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের খুঁজে বের করার কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপুল এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই দফায় দফায় বাংলাদেশে এসে ঘুরে গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, আলামত পরীক্ষা, প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন, সমাবেশে উপস্থিত সাধারণ জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলা বিভিন্নভাবে তারা ঘটনার তদন্ত করেছে বলে জানা যায়। পত্রিকা মারফত আরও জানা যায়, ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে। পুলিশ নাকি চিহ্নিত কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু ঘটনার কোন কূলকিনারা পেয়েছে কি-না তা এখনও জানা যায়নি। বিদেশী সংস্থার লোকজন তাদের কাজ সেরে চলে গেছেন অনেক আগেই। তদন্তের অগ্রগতি যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি আমাদের পুলিশ। অন্য দশটি ঘটনার মতো মানুষ এ ঘটনাও বিস্মৃত হতে যাচ্ছে। সরকার ভুলে যাবে, বিরোধী দল তাদের হৈচৈ থামিয়ে দেবে, সাংবাদিক বা মিডিয়ার লোকজন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। এক সময় সবকিছু চুপচাপ বিস্মৃতির অতল গর্তে হারিয়ে যাবে। তারপর আবার যতদিন পর্যন্ত আরেকটি অমন ভয়াবহ ঘটনা না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ, মিডিয়া এবং রাজনীতি এভাবেই চলবে। আরেকটি ঘটনা ঘটলেই আবার সব কিছু সরব হবে।

সম্প্রতি সরকার গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তাদের তদন্ত শেষ করেছে এবং রিপোর্টও জমা দিয়েছে। কিন্তু তদন্তে উদ্‌ঘাটিত তথ্য, মতামত এবং সুপারিশমালা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সাধারণ জনগণ এবং মিডিয়ার জন্য এখনও তা গোপনীয়। গোপনীয়তার আবরণ উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন কিছু জানার উপায় নেই। কবে, কখন এই মোড়ক খোলা হবে কেউই তা জানে না। অথবা আদৌ তা সকলের জন্য খোলা হবে কি-না, তাও এ মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। কেবল ভবিতব্যই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। তবে যে বিচারপতিকে এই কমিশনের প্রধান করা হয়েছিল তিনি কিছু তথ্য সাধারণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সেখানে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। গ্রেনেড হামলার প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং পরিচালনা এই সংস্থার প্রত্যক্ষ মদদে হয়েছে। তাদের মতে, এ দেশে একটি বাংলাদেশী দল ঐ গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করছে। গ্রেনেড হামলার অভিযান চালানো হয়েছে ঐ গ্রুপের লোকজন দিয়ে। পত্রিকা মারফত আরও জানা যায়, তিনি নাকি ঐ দেশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার বিষয়েও স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমস্ত কর্মটি ঘটিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। মিয়ানমার এবং ভারত আমাদের প্রতিবেশী। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের তেমন কোন দ্বন্দ্ব নেই। যা আছে তাও তেমন প্রকট নয়। আরাকানে মুসলমানদের নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সমস্যা হয়েছিল প্রায় ১৫/১৬ বছর আগে। আরাকানী মুসলমান জঙ্গীদের তাড়া করে নাসাকা বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রতিরোধ করলে তারা তাদের ভূখণ্ডে ফিরে যায়। এই সমস্যার কারণে আরাকানের মুসলমান অধিবাসীরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে আশ্রয় প্রার্থনা করে। জাতিসংঘ এবং আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে মিয়ানমার তাদের শরণার্থীদের

হবে। আর এরা কেনই বা বিরোধী দলের নেতার সমাবেশে হামলা চালাবে এবং তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালাবে তা পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও ভারতের সঙ্গে আমাদের আরও অনেক বিষয়ে টানাপোড়েন রয়েছে। যেমন অভিন্ন নদীসমূহের পানি ব্যবস্থাপনা, কাঁটাতারের বেড়া, ত্রিপুরা থেকে দিল্লী পর্যন্ত কথিত অনুপ্রবেশকারী সমস্যা, শুল্কমুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। আরেকটি বড় সমস্যা আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানি। মার্কিন কোম্পানি ইউকনোল তাদের গ্যাস ফিল্ড থেকে ভারতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রফতানি করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণ এবং আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তাদের সে প্রত্যাশা পূরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে ভারতীয় পত্রপত্রিকা সোচ্চার হলেও বাংলাদেশের মিডিয়া তেমন সোচ্চার নয়। ভারত বৃহৎ দেশ। লোকবল, সামরিক শক্তি, শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা আমাদের তুলনায় সহস্র গুণ শক্তিশালী। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে এই বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সব সময়ই সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রত্যাশা করে। আমাদের কোন সমস্যারই তেমন সমাধান হয়নি। রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা, ক্ষমতাসীন দলের লাইন আপ ইত্যাদি কারণে আমাদের ন্যায্য হিস্যার বিষয়ে আমরা কখনই সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছি না। তাই সমস্যা ধামাচাপা পড়ে থাকছে। সমস্যা সমাধানে বড় দেশ হিসাবে ভারতকে আন্তরিক এবং বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। সমস্যাগুলো কূটনৈতিকভাবে সমাধান করার জন্য উভয় দেশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এত সমস্যার পরও ভারতের সঙ্গে আমাদের চমৎকার প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মদদে বা গোয়েন্দা সংস্থা এ ধরনের হামলা চালাতে পারে বলে তেমন কোন প্রমাণ বা ক্লু এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিশন বা সংস্থা হাজির করতে পারেনি। মাননীয় বিচারপতি যদি তাঁর তদন্তে সে ধরনের কোন ইঙ্গিত বা ক্লু পেয়ে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। জনগণ ও দেশবাসীকে জানাতে হবে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের কোন পদক্ষেপ আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে। কোন রাষ্ট্রকে বা তার কোন সংস্থাকে ইঙ্গিত করার পূর্বে সে বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। অহেতুক কথা চালাচালি নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে।

দেশ এখন দু'টি ধারায় বিভক্ত একটি ডানপন্থী এবং ধর্মীয় ভাবধারায় পরিচালিত। অন্যটি বাম গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত। দু'মেরুতে অবস্থান দুই বড় দলের। নিজের রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গ্রেনেড হামলার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রচেষ্টা থেকে দূরে সরে গেলে চলবে না। তাতে দোষীরা পার পেয়ে যাবে, ঘটনা আড়াল হয়ে যাবে। সবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আসল ঘটনা উন্মোচন করা এবং ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। দেশে দেশে যেভাবে বোমা হামলার কালচার গড়ে উঠেছে তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে, ভাবিয়ে তোলে দেশের ভবিষ্যত নিয়ে। যেভাবেই হোক বোমাসন্ত্রাসীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সকলকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ বিষয়ে সকলের আন্তরিকতা কামনা করি।

টনের দামে বেগুনের কেজি॥খাসির দামে এক কেজি মরিচ

হাবিবুর রহমান মিলন

বার বার আজ মানিক মিঞার কথা মনে পড়ছে। সম্পাদক হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্জয় সাহসী। ভয়-ডর বলতে কিছু তাঁর ছিল না। স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস তাঁর ছিল। সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরও আদর্শগত বিশ্বাসের সঙ্গে আপোস করেননি। তাই বার বার তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছে। কাটাতে হয়েছে দুঃসহ প্রহর। একই কারণে মিঠেকড়া-ভীমরুলখ্যাত আহমেদুর রহমান ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে পিআইএ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পর তিনি লিখেছিলেন, 'তরুণ যুবক আহমেদের মৃত্যু আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। সে ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত।'

প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা হবি থাকে। খাবার দাবার ব্যাপারে বেজায় শৌখিন ছিলেন মরহুম মানিক মিঞা। তিনি মনে করতেন যে, ভাল খেতে হলে নিজে বাজারে গিয়ে পছন্দসই মাছ-মাংস, তরি-তরকারি কিনতে হবে।

আমি তখন দৈনিক সংবাদে সহ-সম্পাদক। অনেকের মতো মানিক মিঞা ও ভীমরুলের লেখার প্রচণ্ড ভক্ত। তখন ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পাতাই ছিল পত্রিকাটির প্রধান আকর্ষণ। একদিন সম্পাদকীয় পাতায় চোখ বুলাতে থ' বনে গেলাম। লেখার প্রথম লাইনটি প্রায় চার দশক পর আজও ভুলতে পারিনি। লেখাটি তিনি শুরু করেন এভাবে– "গতকাল বাজারে গিয়েছিলাম। গরুর দামে একটা রুই মাছ কিনে আনি।" এরপর সেই স্বৈরাচারী আমলেও সরকারী ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা ও জনগণের দুঃখ দুর্ভোগ নিয়ে যা লেখা হয় বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ও তা লেখার সাহস আমাদের নেই। কারণ ক্রসফায়ার এবং হার্ট এ্যাটাকের খেলা কার না হৃৎকম্প বাড়ায়। মানিক মিঞার কপাল ভাল এবং আমাদের কপাল মন্দ– আজ তিনি বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়ত স্নায়বিক উত্তেজনায় মারা যেতেন। আর না হয় যেতে হতো অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে। টনের দামে এক কেজি বেগুন এবং খাসির দামে এক কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হতে দেখে তিনি কী ভাষায় সরকারের গোষ্ঠী উদ্ধার করতেন তা ভাবতে গেলেও মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে।

তরকারি হিসাবে বেগুন কুলীন নয়। বেগুনে চুলকানি হয়, এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা। এক সময় তাই এর প্রতি মানুষের কোন আগ্রহ ছিল না। ষাটের দশকের শেষভাগেও এক সের বেগুনের দাম ছিল দু' পয়সা, চার পয়সা। রূপকথার মতো শোনালেও ঘটনা সত্য। ফাগুন-চৈত্র মাসে মানুষ বেগুনের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চাইত না। এখন সে বেগুনের কেজি ৮০ টাকা। আর কাঁচামরিচের কেজি গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ১৮০ থেকে ২০০ টাকা। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"–কথাটি কি কবি

ব্যবস্থাপনার চরম ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণে ক্ষমাহীন ব্যর্থতা ছাড়া বর্তমানও পরিস্থিতি এমন অচিন্তনীয় হতে পারত না। এমনই দুর্ভাগ্য যে, এর পরও সরকারকে অকার্যকর বলা যাবে না। তা হলে তাঁরা গোস্‌সা করেন।

ইতোমধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী দেশবাসীকে একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন। বাণীটি হচ্ছে– (ক) অধৈর্য হবেন না। মাত্র তিনটি দিন সবুর করুন। বৃষ্টি না হলে চালের দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। (খ) তরিতরকারির দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নামিয়ে আনতে সময় লাগবে সাতদিন। মান্যবর ব্যক্তিরা যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেন জনগণ তখন তা বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু বিশ্বাস জঙ্গলের আগাছা নয়। বাস্তব প্রমাণ হতেই বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি হয়ে থাকে। মান্যবর মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তিনদিনের পর সাতদিনও অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু চাল-ডাল, তরিতরকারি সবকিছুর দাম আগের ন্যায় অগ্নিবৎ। একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল পাইকারি বিক্রেতাদের যে অভিমত প্রচার করেছে এতে স্পষ্ট যে, সামনের দিন আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে।

এক খবরে জানা যায় যে, বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার নাকি র‍্যাবকে নামানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। এটি আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞান। কেননা, র‍্যাবের কাজ বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা নয়। এর জন্য সরকারের স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। র‍্যাব নামানোর অর্থ কি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয়া? যদি তা হয়, তাহলে জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে এ মাল পোষার মানে কি? বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য র‍্যাব নামানোর কথা শুনে আমার একটি পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবীয় স্বৈরাচার ক্ষমতা দখল করার পর জেনারেল ওমরাও খান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর নিযুক্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি হুকুম জারি করেন যে, 'জিনিস-পত্রের দাম কমাও।' সঙ্গে সঙ্গে চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় সব জিনিসের দাম অর্ধেক কমে যায়। সুযোগ বুঝে মজুদদাররা সব কিনে নেয়। দু'দিন না যেতে বাজার সাফ। কোথাও কোন জিনিস নেই। ওমরাও খান তখন ব্যবসায়ীদের গবর্নর হাউসে আমন্ত্রণ জানান। চা-নাস্তা পরিবেশন করার পর হাতজোড় করে বলা হয় যে, 'ভাইসব, আপনারা জিনিসপত্রের সরবরাহ বাড়ান। সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবে না।' দু'দিন না যেতে বাজার আবার পণ্যসম্ভারে ভরে ওঠে। তবে ক্রেতাদের কিনতে হয় পূর্বাপেক্ষা দু'তিন গুণ অধিক দামে। ওমরাও খান বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। তবে সকলে বুঝেছিল যে, অর্থনীতি মার্শালনীতির নিয়মে চলে না। র‍্যাব নামানোর সঙ্গে যদি কোন 'ক্রসফায়ারের' ঘটনা ঘটে তবেই সারছে আর কি। অতীত অভিজ্ঞতা হতে আপাতত সেদিকে তাকিয়ে থাকার বিকল্প নেই।

আবহমানকাল জিনিসপত্রের দাম এক রকম থাকবে এমন কোন শাস্ত্রীয় বিধান নেই। কোন পাগলেও তা ভাবে না। বাজার দরে ওঠা-নামা হতেই পারে। তবে কতটা? জনগণের সর্বোচ্চ ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে কি? তাহলে সরকারের কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যাবে কোথায়?

জিনিসপত্রের দাম আকাশ স্পর্শ করার পরও এখন পর্যন্ত জনজীবন নিস্তরঙ্গ। কোন আন্দোলন-বিক্ষোভ নেই। এটি হতে পারে সরকারের আপাত স্বস্তির কারণ। কিন্তু এ স্বস্তি–স্বস্তি নয়। প্রচণ্ড ঝড়ের আগেই প্রকৃতি গুমোট ভাব ধারণ করে বেশি। এও তা কিনা কে বলবে। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে আবু হোসেন সরকারের আমলে চালের দাম হঠাৎ করে মণপ্রতি ১০/১৫ টাকা বেড়ে যায়। জনজীবনের দুঃখ-দুর্ভোগের বিষয় বিবেচনা করে সরকার গুদাম খুলে দেয়। ধরে নেয়া যায় যে, এর ফলে চালের বাজার দর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে। কিন্তু একটি ভুল ছিল সিদ্ধান্তে। একজন সর্বোচ্চ কত মণ চাল নিতে পারবে তা বেঁধে দেয়া হয়নি। পরিণামে মজুদদাররা গুদাম শূন্য করে ফেলে। বাজার দর যেই-কি সেই থেকে যায়। সপ্তাহখানেক বিরাজ করে থমথমে অবস্থা। এর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কেরানীগঞ্জ থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত বের হয় বিক্ষুব্ধ ভুখা মিছিল। আবু হোসেন সরকার পুলিশ লেলিয়ে ভুখা মিছিল পণ্ড করার চেষ্টা চালান। কিন্তু পেটে যখন ক্ষুধার আগুন জ্বলে পুলিশী ব্যবস্থা তখন কাজ দেয় না। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'– বলে আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে পালাতে হয়।

টনের দামে এক কেজি বেগুন, এবং খাসির দামে এক কেজি কাঁচামরিচের বাজারে মানুষ যখন দিশেহারা তখন উত্তরবঙ্গে চলছে মঙ্গা। সিনিয়র এক মন্ত্রী বলেছেন, মঙ্গা আবার কী জিনিস। বটেই তো! মহামঙ্গার আঘাতে কঙ্গোর জনজীবন যখন বিপর্যস্ত তখন কৃষ্ণকায় এক মন্ত্রী তাঁর শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীর জন্য সোনার পালঙ্ক তৈরি করেছিলেন। মহামঙ্গা কী তিনিও তা বুঝতে পারেননি। বুঝতে পেরেছিলেন মন্ত্রিত্ব হারিয়ে চোখের পানি নাকের পানি একাকার হওয়ার পর। সিনিয়র মন্ত্রীও হয়ত বুঝতে পারবেন। এখন হয়ত বুঝতে পারছেন না এ জন্য যে, তিনি দেখতে পাচ্ছে, নেতৃত্বের সঙ্কট। কিন্তু এ সঙ্কট থেকেই যাবে এমন মনে করা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার পরিণতি। বিজ্ঞানের নিয়মে শূন্যস্থান কখনও শূন্য থাকে না। '৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়ও নেতৃত্বের সঙ্কট ছিল। কিন্তু একদিন ঘটনা থেকে জন্ম নিল এক নেতার। আর তাঁর সংগঠিত জনতার শক্তি কোথায় ভাসিয়ে দিল আইয়ুবীয় স্বৈরাচারের 'সেনা বেড়াজাল।' তাই নেতৃত্বের সঙ্কট বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে আত্মতুষ্টি বোধ করার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

'পলাশী থেকে ধানমণ্ডি'॥নাটকের পেছনে নাটক

বেলাল বেগ

জীবদ্দশায় কিংবদন্তি, গাফ্‌ফার চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি নাটক লিখছেন এ কথা আমরা জানতাম। সে নাটক লন্ডনে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে জানিয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা, বিজ্ঞানী ও লেখক ড. নুরুন নবী বঙ্গবন্ধু

হ্যামলেটের মতোই এ মুজিব দর্শককে দারুণ বিস্মিত ও আবেগাপ্লুত করে দেন। অভিনয়ের পরদিন পীযুষ বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঠা, বসা, হাঁটা, পাইপ ধরা, পাইপ জ্বালানো, বলা ইত্যাদি এত নিঁখুত করে অনুকরণ করলেন কিভাবে? একগাল হেসে নিষ্ঠাবান কঠোর পরিশ্রমী কৃতী এই অভিনেতা বললেন, প্রথমত, আমি গোপালগঞ্জের ছেলে; বঙ্গবন্ধুর ভাষাই আমার ভাষা, দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছে থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। গাফ্ফার ভাই বলেছেন পীযুষের আগে বাংলাদেশের দু'জন শক্তিমান অভিনেতাকে মুজিব চরিত্রে অভিনয় করার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা নানা অজুহাতে অসম্মতি জানাতে তিনি খুব মনোকষ্ট পেয়েছেন। আমার মতে ব্যাপারটিতে কোথাও ভাগ্যের একটা রহস্য খেলা করেছে। কারণ, এ চরিত্রে অভিনয় করে পীযূষ বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছেন, যা প্রত্যাখ্যানকারী শিল্পীদের কপালে হয়তবা জুটবে না। পীযুষের দেহাবয়ব, উচ্চতা, কণ্ঠস্বর, খাঁটি ফরিদপুরের উচ্চারণ এবং অবিকল বঙ্গবন্ধুর বলার ঢং, তার সঙ্গে অসাধারণ মেকআপ পীযূষকে এ অমরতা দান করল।

ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। দক্ষতার সঙ্গে ঐ কাজটিই করেছেন প্রবাদ পুরুষ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। নাটকের প্লট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ছকে আঁকা। সিরাজদ্দৌলা নাটকের শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ সব চরিত্র এ নাটকে আছে। এমনকি আলেয়াও বাদ পড়েনি। বঙ্গবন্ধুর হত্যার আগে রমনা পার্কে একজন যুবক ও একজন যুবতী খুন হয়েছিল। ওটা নষ্ট মেয়ের প্রেমঘটিত কারণ ছিল বলে তখনকার কোন কোন পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছিল। আসলে ওরা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করার জন্য বঙ্গভবনে যাচ্ছিল। এরাই এ নাটকে আলেয়া উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা।

'পলাশী থেকে ধানমণ্ডি' নাটক এবং তার বিভিন্ন দিকের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ নাটক করা কতখানি কষ্টসাধ্য এবং তারও বেশি কতটুকু চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিল সে কাহিনী শোনানো আমার প্রধান উদ্দেশ্য। হাসান ইমাম, বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকার দুই কর্ণধার কর্নেল ফারুক চরিত্রে অভিনয়কারী সউদ চৌধুরী এবং বেগম মুজিবের ভূমিকায় অভিনয়কারী ঝর্ণা চৌধুরীর সঙ্গে এক দাওয়াতে দেখা হয়েছিল ১১ অক্টোবর, নাটক মঞ্চস্থ হবার দু'দিন পরে। সেখানেই শুনলাম নাটকের পেছনে নাটকের রোমাঞ্চকর বহু টুকরো কাহিনী।

প্রথমেই রিহার্সেলের কথা। নিউইয়র্ক একটি রাজ্যের মতো বিরাট শহর। এখানে মানুষ সপ্তাহের সাতদিনে চব্বিশ ঘণ্টা কর্মব্যস্ত থাকে। ২০/৩০/৫০ মাইল দূর থেকে এসে একসঙ্গে নাটকের নিয়মিত রিহার্সেল প্রায় অসম্ভব। হাসান ভাই বললেন যাঁকে যখন যেখানে পেয়েছেন, তখনই তাঁকে রিহার্সেল করিয়েছেন। মঞ্চ-রিহার্সেল দূরের কথা একসঙ্গে একটার বেশি পূর্ণাঙ্গ সংলাপ- রিহার্সেলও সম্ভব হয়নি। শেষের দৃশ্য, যা দেখে বহু দর্শক ডুকরে কেঁদে উঠেছিল–তার কোন রিহার্সেলই হয়নি। এ অসাধ্য সাধন হয়েছে শিল্পীদের অসাধারণ আন্তরিকতার জন্য। রাসেলের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিশুশিল্পীকে একবার মাত্র বলা হয়েছিল সে যেন তিনটি গুলি খেয়ে মরে। সে কথা সে ঠিকই মনে রেখেছিল। নিউইয়র্কে নাটকের বহু শিল্পী থাকা সত্ত্বেও দু'-একটি চরিত্রে দুর্বল শিল্পী কেন ছিল তার কারণ দেখালেন সউদ চৌধুরী। সকলের কর্মব্যস্ততার জন্য শিল্পী নির্বাচন যেন ছিল পাল্লায় ব্যাঙ মাপা। দু'দিন রিহার্সেলের পর একজন গায়েব হয়ে গেলেন তো আরেকজন কথা দিয়েও আসেন না। খন্দকার মোশতাক চরিত্রে বেশ ভাল যাকে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি বেশ ক'দিন মহাউৎসাহে রিহার্সেল করলেন। একদিন হঠাৎ টেলিফোন করে বললেন তিনি নাটকে থাকবেন না। আয়োজকদের মাথায় হাত। এই শেষ মুহূর্তে তাঁরা কোথায় যাবেন? শেষে তিনিই আবার উদ্ধার করলেন। লন্ডনে মোশতাক চরিত্রে অভিনয়কারীকেআসা-যাবার খরচটাই তিনি দিয়ে দিলেন। শোনা গেল পরিবারে আওয়ামী-বিএনপির দ্বন্দ্বই ঐ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

নিউইয়র্কে উল্লেখযোগ্য কোন মেকআপম্যান নেই। কলকাতার এক ভদ্রলোক শখের বশে নাটকের মেকআপ করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটু সম্মানী দিতে গেলে ভদ্রলোক প্রবল আপত্তি করে বললেন, এমন একটি নাটকে অংশ নিতে পারাটাই ভাগ্যের বিষয়।

নাটকের পেছনে নাটকের আসল ঘটনা দস্তুরমতো হিন্দী সিনেমার গল্প। নাটক হবে শনিবার, ছুটির দিনে। ওদিন কর্তৃপক্ষের কোন কাকপক্ষিও থাকবে না। সুতরাং আগের দিন শুক্রবারেই হলের চাবি নিয়ে নিতে হবে। ওদিকে যাবতীয় প্রপস ও লাইটও যোগাড় করে রাখতে হবে একইদিনে। কুইন্স থেকে ম্যানহাটন গিয়ে লাইট আনতে হবে। আনার জন্য কাউকে তখন পাওয়া যাচ্ছে না। বেগম মুজিবের ভূমিকায় চূড়ান্ত রিহার্সেল ফেলে রেখে ভ্যান চালানোর অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ঝর্ণা চৌধুরী ভ্যান নিয়ে ছুটে গেলেন ম্যানহাটন। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সংলাপ-রিহার্সেল হচ্ছিল তখন মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসীন আলীর অফিসে। সেখানে হঠাৎ পুলিশের টেলিফোন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের। তারা অনুষ্ঠান করতে দেবে না, কারণ বাংলাদেশ সরকারের হয়ে কেউ বলেছে গফ্ফার চৌধুরী নামে একজন সন্ত্রাসী ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে এবং একদল লোক প্রতিবাদ বিক্ষোভ করবে। এতে শান্তি ভঙ্গ হবে। বিনা মেঘে বজ্রপাত! ঝর্ণা চৌধুরী তখন ম্যানহাটন থেকে ফেরার পথে গাড়িতে। রিহার্সেল কেমন হচ্ছে তা জানার জন্য মোবাইল থেকে ফোন করেছিলেন। তারপর শুনলেন ভয়ঙ্কর খবর। নাটক হবে না। দু'মাস ধরে এত মানুষের এমন কঠোর পরিশ্রম, বিপুল অর্থব্যয় সবই ব্যর্থ করে দিল বদমাশরা। ঝর্ণা চৌধুরীর মাথা ঘুরছে। একহাতে গাড়ির স্টিয়ারিং অন্যহাতে মোবাইল। ড. নূরুন নবী, সউদ চৌধুরীকে জানালেন। স্কুল অফিস বন্ধ হতে মাত্র ২৫ মিনিট বাকি। মুক্তিযোদ্ধা-পুত্র ফাহিম রেজা নূর জান হাতে নিয়ে ছুটে গেলেন স্কুলে। গাড়ি ঘুরিয়ে সেখানে হাজির হলেন ঝর্ণা চৌধুরীও। শুরু হলো দেনদরবার। সন্ত্রাস ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ভীত প্রিন্সিপ্যাল হল দিতে কিছুতেই রাজি নন। হঠাৎ উদয় হলেন পার্থ প্রতিম মজুমদার। পার্থ সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক কম্পিউটার কোম্পানির জন্য বিজ্ঞাপন করে আরও বিশ্বখ্যাতি